بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ মে ২০১৮, মোতাবেক ১১ হিজরত ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ আমি যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্বপ্রথম হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)। তাঁর মা উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, যিনি সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ফুফু ছিলেন আর এই হিসেবে তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর ফুপাত ভাই। মহানবী (সা.) দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। **(উসদুল গাবা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৮৯, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ, বৈরুতের দ্বারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত)**

দ্বারে আরকাম হলো সেই স্থান বা কেন্দ্র যা এক নও মুসলিম আরকাম বিন আরকামের বাড়ি ছিল এবং মক্কা থেকে কিছুটা বাইরে ছিল। মুসলমানরা সেখানে সমবেত হত আর ধর্ম শেখার এবং ইবাদত ইত্যাদি করা জন্য (এটি) একটি কেন্দ্র ছিল। আর এই খ্যাতির কারণে এর নাম দ্বারুস সালাম হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করে, মক্কায় এটি তিন বছর পর্যন্ত (মুসলমানদের) কেন্দ্র ছিল। মুসলমানরা সেখানে নীরবে ইবাদত করতেন আর মহানবী (সা.)-এর বৈঠক বসত। এরপর হযরত উমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মুসলমানরা প্রকাশ্যে বাইরে বের হতে আরম্ভ করেন। রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উমর (রা.) ছিলেন এ কেন্দ্রে ইসলাম গ্রহণকারী শেষ ব্যক্তি। **{সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), রচয়িতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম. এ, পৃ: ১২৯}**

যাহোক, এই (জায়গাটি) কেন্দ্রে রূপ নেয়ার পূর্বেই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনা অনুসারে কুরাইশ মুশরিকদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে তার পরিবারও নিরাপদ ছিল না। তিনি তার উভয় ভাই হযরত আবু আহমদ এবং উবায়দুল্লাহ্ আর তার বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ, হযরত উম্মে হাবীবা এবং হযরত হিমনা বিনতে জাহাশের সাথে দু'বার ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তাঁর ভাই উবায়দুল্লাহ্ ইথিওপিয়া গিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল আর সেখানেই খ্রিষ্টান অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। আর তার স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ানের ইথিওপিয়াতে থাকাবস্থায়ই মহানবী (সা.) তাকে বিয়ে করেন। **(উসদুল গাবা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৮৯, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ, বৈরুতের দ্বারুল ফিকর থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত)**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.) মদীনায় হিজরতের পূর্বে (ইথিওপিয়া থেকে) মক্কায় আসেন আর এখান থেকে তাঁর গোত্র বনু গানামে দুদানের সব মানুষকে (তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল) সাথে নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে গিয়ে মক্কাকে এমনভাবে খালি করে দেন যে, গোটা এলাকা বিরাণ হয়ে যায় এবং অনেক বাড়িঘর খালি হয়ে যায়। **(আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, লে-ইবনে সাদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৯, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ, বৈরুতের দ্বার এহইয়াউত্ তারাসিল আরাবী থেকে ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত)**

বর্তমানে পাকিস্তানের কোন কোন স্থানে আহমদীরাও এই অবস্থারই সম্মুখীন, কোন কোন গ্রাম খালি হয়ে গেছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, বনু জাহাশ বিন রেয়াব মক্কা থেকে হিজরত করলে আবু সুফিয়ান বিন হারব তাদের বাড়ি আমর বিন আলকামার কাছে বিক্রি করে দেয়। মদীনায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে তা নিবেদন করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আব্দুল্লাহ্! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, এর বিনিময়ে খোদা তোমাকে জান্নাতে প্রাসাদ দিবেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি এতে সন্তুষ্ট। তখন তিনি (সা.) বলেন, তাহলে (নিশ্চিত থাক) সেই প্রাসাদ তোমার জন্য নির্ধারিত আছে। **{সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৫২, বাব হিজরাতুর রসূল (সা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়া থেকে ২০০১ সনে প্রকাশিত}** অর্থাৎ যে ঘরবাড়ি তোমরা পরিত্যাগ করে এসেছ, তার পরিবর্তে তোমরা জান্নাতে স্থান পাবে এবং সেখানে প্রাসাদ নির্মিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-কে মহানবী (সা.) নাখলা উপত্যকা অভিমুখে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। বিভিন্ন পুস্তকে এর উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) একদিন এশার নামায শেষে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে বলেন, প্রভাতে (তুমি) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসবে, তোমাকে এক জায়গায় পাঠাব। অতএব, হুযূর (সা.) ফজরের নামায শেষ করার পর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে তার তীর, তূণ এবং বর্ষা ও বর্মসহ তার বাড়ির দরজায় অপেক্ষমান দেখতে পান। মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কাবকে ডেকে পাঠান এবং তাকে একটি পত্র লেখার নির্দেশ দেন। সেই পত্রটি লেখার পর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে ডেকে সেই পত্রটি তাকে দিয়ে {তিনি (সা.)} বলেন, আমি তোমাকে এই দলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করছি, (অর্থাৎ) যে দলটি তাঁর নেতৃত্বে পাঠানো হয়েছিল। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, এর পূর্বে তিনি এই দলের দায়িত্বে হযরত উবায়দা বিন হারেসকে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্বে তিনি যখন বিদায় নেওয়ার জন্য নিজের বাড়ি যান তখন তার সন্তানরা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করে। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে তার স্থলে আমীর নিযুক্ত করে পাঠান। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে প্রেরণের সময় মহানবী (সা.) তাকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে ভূষিত করেন। সীরাতুল হালবিয়াতে এটি লেখা আছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশই সেই সর্বপ্রথম সৌভাগ্যবান সাহাবী, যাকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধি প্রদান করা হয়েছে। **(আস্ সীরাতুল হালবিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ২১৭, সারিয়াতু আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ ইলা বাতনে নাখলা, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল ইলমিয়া থেকে ২০০২ সনে মুদ্রিত)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ **(সূরা আল্ বাকারাঃ ২১৮)** আয়াতের ব্যাখ্যায় এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেন যে,

মহানবী (সা.) পবিত্র মক্কা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাতে হিজরত করে আসার পরও মক্কাবাসীর ক্রোধের মাত্রা প্রশমিত হয় নি বরং তারা মদীনাবাসীদের হুমকি দিতে আরম্ভ করে যে, তোমরা যেহেতু আমাদের লোকদেরকে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছ তাই তোমাদের জন্য এখন একটি পথই খোলা আছে, তোমরা হয় এদের সবাইকে হত্যা কর আর না হয় তাদেরকে মদীনা থেকে বহিস্কার কর। অন্যথায় আমরা কসম খেয়ে বলছি যে, আমরা মদীনায়

আক্রমন করব আর তোমাদের সবাইকে হত্যা করে তোমাদের মহিলাদের করায়ত্ব করে নিব। এরপর তারা শুধু হুমকি দিয়েই থেমে থাকে নি বরং মদীনায় আক্রমন করার জন্য প্রস্তুতি নিতেও আরম্ভ করে। সেসময় মহানবী (সা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, অনেক সময় তিনি সারারাত জেগে কাটাতেন। একইভাবে সাহাবীরা রাতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘুমাতেন, পাছে কোথাও রাতের অন্ধকারে শত্রু আবার অতর্কিতে আক্রমণ না করে বসে। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) একদিকে মদীনার চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্রের সাথে এই শর্তে চুক্তি করতে আরম্ভ করেন যে, যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে তারা মুসলমানের সঙ্গ দিবে। অপরদিকে কুরাইশরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে– এসব সংবাদের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) দ্বিতীয় হিজরীতে আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে বারোজন লোকের সাথে নাখলা প্রেরণ করেন আর তাকে একটি পত্র দিয়ে বলেন, এ পত্রটি যেন দু'দিন পর খোলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ দু'দিন পর সেই পত্র খুললে তাতে লেখা ছিল, তুমি নাখলায় অবস্থান কর আর কুরাইশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তা আমাদের অবহিত কর। ঘটনাচক্রে কুরাইশের একটি ছোট্ট দল সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে ফিরতি পথে সেখান দিয়ে অতিক্রম করে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ নিজের বোধ-বুদ্ধি অনুসারে তাদের ওপর আক্রমন করে বসেন। এর ফলে কাফিরদের মধ্য হতে আমর বিন আল্ হাযরামী নিহত হয় এবং দু'জন আটক হয় আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদও মুসলমানেরা করতলগত করে। মদীনায় ফিরে এসে তিনি মহানবী (সা.)-কে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেই নি আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণেও তিনি (সা.) অস্বীকৃতি জানান।

ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাসের বরাতে লিখেন, **"হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং তার সঙ্গীদের দ্বারা যে ভুলটি হয়েছিল তা হল, তারা মনে করেছিল এখনো রজব মাস আরম্ভ হয় নি, অথচ রজব মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এটি ত্রিশ জমাদিউস সানী, রজব (মাস) এখনো শুরু হয় নি। যাহোক, মুসলমানদের হাতে আমর বিন হাযরামীর নিহত হওয়ার কারণে পৌত্তলিকরা হৈ-চৈ আরম্ভ করে বলে, এখন মুসলমানরা সেসব পবিত্র মাসের পবিত্রতারও তোয়াক্কা করছে না যাতে সকল প্রকার যুদ্ধ বন্ধ থাকত।"** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে এই আপত্তিরই খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, নিঃসন্দেহে এই মাসগুলোতে যুদ্ধ করা খুবই অপছন্দনীয় কাজ এবং আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পাপ বিশেষ। কিন্তু এর চেয়েও ঘৃণ্য বিষয় হল, মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার পথে বাধা দেয়া এবং আল্লাহ্‌র তৌহীদকে অস্বীকার করা আর মসজিদে হারামের সম্মানকে পদদলিত করা এবং এর অধিবাসীদেরকে বিনা দোষে শুধু এই কারণে নিজেদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করা যে, তারা আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান এনেছিল। একটি কথা তোমাদের মনে পড়ল ঠিকই কিন্তু তোমরা একথা চিন্তা কর নি যে, তোমরা নিজেরা কত বড় অপরাধ করছ। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করে এবং মসজিদে হারামের সম্মান পদদলিত করে, এর অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে কত অপছন্দনীয় কাজ করেছ। যেখানে তোমরা নিজেরাই এসব অপকর্মে লিপ্ত সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন মুখে তোমরা আপত্তি**

কর? তারা তো না জেনে একটি ভুল করেছে কিন্তু তোমরা তো ইচ্ছাকৃতভাবে এসব অন্যায় করছ।” (তফসীরে কবীর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৪-৪৭৫, সূরা বাকারা ২১৮ নাম্বার আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)

বুখারীর একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের এই যুদ্ধাভিযানের ইতিবাচক ফলাফলের উল্লেখ করতে গিয়ে এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, **“ঘটনা প্রবাহে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই প্রতিনিধি দলকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাতে তারা পূর্ণরূপে সফল হন এবং তারা বন্দীদের মাধ্যমে মক্কার কুরাইশদের ষড়যন্ত্র এরং তাদের গতিবিধি সম্পর্কেও নিশ্চিত সংবাদ লাভ করেন। হাযরামীর কাফেলা সংক্রান্ত ঘটনাটি একটি কাকতালীয় এবং দৈব ঘটনা ছিল। কোন কোন ইতিহাসবিদের মতামত হল, এই অভিযানে কতক সদস্যের মাঝে মুহাজিরদের হারানো ধনসম্পদের ক্ষতিপূরণের চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল– এমনটি ভাবা সঠিক নয়। বরং এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল হাযরামীর কাফেলার মাধ্যম আবু সুফিয়ান বিন হারবের নেতৃত্বে পরিচালিত কাফেলার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং মক্কার কুরাইশের যুদ্ধ-পরিকল্পনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্যাদি লাভ করা আর চুপিসারে এই দায়িত্বই তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তাই তারা এই ছোট্ট কাফেলাকে করায়ত্ত্ব করার সুযোগ হাত ছাড়া করে নি। এটি একটি অবাস্তব ধারণা যে, তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল মক্কার কুরাইশদের যুদ্ধের প্রস্তুতি–সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য কিন্তু তারা কাফেলা লুট করেই মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসাকে যথেষ্ট মনে করেছিল।**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ অনেক বড় মাপের সাহাবী ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর ফুপাত ভাইও ছিলেন। তিনি (সা.) একজন বিশ্বস্ত ও গোপনীয়তা রক্ষাকারী ব্যক্তিকে এই অভিযানের জন্য বেছে নিয়েছেন। মহানবী (সা.) যখন মক্কার কুরাইশদের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি (সা.)ও প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন আর এ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখেন।” (সহীহ্ বুখারী, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৫, কিতাবুল মাগাযী, বাব কিচ্ছা গাযওয়ায়ে বদর, রাবওয়ার যিয়াউল ইসলাম প্রেস থেকে মুদ্রিত)

তিনি লিখেছেন, মাগাযীতে এমন ঘটনাবলী এসেই থাকে অর্থাৎ যুদ্ধ–সংক্রান্ত বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং তার সঙ্গীদের প্রতি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই অসন্তোষ এদিক থেকে যুক্তিযুক্ত ছিল, কেননা তাদের অভিযানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা নৈরাজ্যের কারণ হতে পারত। কিন্তু অনেক সময় কিছু বিষয় বাহ্যত ভুল মনে হলেও তা ঐশী ইচ্ছার অধীনে ঘটে থাকে আর কোন কোন ছোট ঘটনা অসাধারণ ফলাফলে পর্যবসিত হয়। তাই যদি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের নেতৃত্বাধীন দলকে অভিযানে প্রেরণ করা না হত এবং তাদের দ্বারা যা কিছু ঘটেছে তা না ঘটত আর আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে আগত বাণিজ্য কাফেলা নির্বিঘ্নে মক্কায় পৌঁছে যেত তাহলে কুরাইশরা সেই বাণিজ্য কাফেলাকে কাজে লাগিয়ে অনেক বড় প্রস্তুতির সাথে মুসলমানদের ওপর আক্রমন করার সমূহ সম্ভাবনা ছিল, যার মুখোমুখি হওয়া সহায়সম্বলহীন স্বল্পসংখ্যক সাহাবীদের জন্য অসম্ভব ছিল। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ–সংক্রান্ত ঘটনার ফলে কুরাইশের অহংকারী নেত্রীবৃন্দ তেলে–বেগুনে জ্বলে উঠে আর

এই ক্রোধ ও অহংকারের বশে তড়িঘড়ি করে প্রায় এক হাজার সশস্ত্র সেনাদল নিয়ে নিজেদের কাফেলার সুরক্ষার অভিপ্রায়ে বদর প্রান্তরে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু তারা এটি জানত না যে, সেখানেই তাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। অপর দিকে এই শঙ্কাও ছিল যে, সাহাবীরা যদি জানতে পারতেন, একটি সশস্ত্র সেনাদলকে মোকাবিলার জন্য তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে তাদের কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যেতেন। তাই গোপনীয়তা এখানে সেই কাজ করেছে, যা যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষাব্যুহ করে থাকে, যাকে আধুনিক যুদ্ধের পরিভাষায় ছদ্মবেশ বা ক্যামোফ্ল্যাশ বলা হয়ে থাকে"। **(সহীহ্ বুখারী, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৭, কিতাবুল মাগাযী, বাব কিচ্ছা গযওয়ায়ে বদর, রাবওয়ার জিয়াউল ইসলাম প্রেস থেকে মুদ্রিত)**

ইতিহাসে লেখা আছে, 'খোদা এবং রসূলের প্রেম তাদেরকে জগতের সবকিছু থেকে বিমুখ করে দিয়েছিল। তাদের একটিই বাসনা ছিল, নিজেদের প্রিয় জীবন যেন কোনভাবে খোদার পথে উৎসর্গ হয়ে যায়। অতএব, তাদের এ বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আর **আল্ মুজাদ্দাউ ফিল্লাহ্** (খোদার পথে যাদের কান কর্তিত হয়েছে) তাদের নামের এক স্বতন্ত্র প্রতীক হয়ে গেছে।" **(উসদুল গাবা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯০, আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ, বৈরুতের দ্বারুল ফিকর থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত)**

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ, অর্থাৎ তার দোয়া কীভাবে গৃহীত হতো- এ সম্পর্কে তার শাহাদতের পূর্বের দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ। ইসহাক বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ আমার পিতা অর্থাৎ সা'দকে উহুদের যুদ্ধের দিন বলেন, এসো! খোদার কাছে দোয়া করি। অতএব তারা উভয়ে এক পাশে চলে যান। প্রথমে হযরত সা'দ (রা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আগামীকাল শত্রুর সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হবে তখন আমি যেন এমন ব্যক্তির মুখোমুখি হই, যে হবে আক্রমণে কঠোর এবং খুবই প্রতাপান্বিত। অতএব আমি যেন তার সাথে যুদ্ধ করে তোমার খাতিরে তাকে হত্যা করি এবং তার অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করি। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ আমীন বলেন। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আগামীকাল আমার সামনে যেন এমন ব্যক্তি আসে যে হবে আক্রমণে কঠোর এবং খুবই প্রতাপান্বিত, আর আমি যেন তোমার খাতিরে তার সাথে যুদ্ধ করি এবং সেও যেন আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় (আর) জয়যুক্ত হয়ে আমাকে হত্যা করে এবং আমাকে আটক করে আমার নাক এবং কান কেটে ফেলে। কাজেই, আমি যখন তোমার দরবারে উপস্থিত হব তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আব্দুল্লাহ্! কার খাতিরে তোমার নাক এবং উভয় কান কর্তিত হয়েছে? তখন আমি বলব, তোমার এবং তোমার রসূল (সা.)-এর খাতিরে। প্রত্যুত্তরে তুমি বলবে, তুমি সত্য বলেছ। হযরত সা'দ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উত্তম ছিল তাই আমি শেষ দিনে দেখেছি তার নাক এবং উভয় কান একটি সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। **{উসদুল গাবা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৯০ আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.) বৈরুতের দ্বারুল ফিকর থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত}** অর্থাৎ এগুলো কর্তিত ছিল এবং তা গেঁথে রাখা হয়েছিল।

এমন পাশবিক কার্যকলাপ কাফিররা করত আর বর্তমানে কোন কোন কট্টরপন্থী মুসলমানও ইসলামের নামে একই কাজ করছে।

হযরত মুত্তালেব বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হান্তাব রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.) যেদিন উহুদ অভিমুখে যাত্রা করেন সেদিন তিনি (সা.) শায়খাইন নামে মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় রাত্রি যাপন করেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) একটি ছাগলের ভুনা রান নিয়ে আসেন, যা থেকে মহানবী (সা.) আহার করেন। একইভাবে নাবীয তথা খেজুর ভিজানো পানি নিয়ে এলে তিনি (সা.) তাও পান করেন। আমার মনে হয় এটি এক প্রকার হারীরাহ্ বা পানীয় হবে। এরপর একজন সেই খেজুর ভিজানো পানির পেয়ালা নিয়ে নেয় এবং তা থেকে কিছুটা পান করে। এরপর সেই পেয়ালা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ নেন এবং পুরোটাই পান করে ফেলেন। এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে বলেন, কিছুটা আমাকেও দাও। তুমি কি জান, আগামীকাল প্রভাতে তুমি কোথায় যাবে? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ বলেন, হ্যাঁ, আমি জানি। আল্লাহ্র সাথে পিপাসার্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ করার চেয়ে পরিতৃপ্ত অবস্থায় মিলিত হওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় (অর্থাৎ ভালোভাবে পানাহার করা অবস্থায়)। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫০, ওয়া মিন বনী হুলাফা বনী শামস... বৈরুতের দ্বারুল এহইয়াউত তারাসির আরাবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

খোদা তা'লাকে ভালোবাসার অদ্ভুত রীতি ছিল সাহাবীদের আর এর জন্য তাদের প্রস্তুতির ধরনও অভিনব।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-কে একই কবরে সমাহিত করা হয়েছিল। হযরত হামযা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের খালু ছিলেন, আর শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল চল্লিশ বছরের কিছু বেশি। মহানবী (সা.) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওলী হন এবং তার পুত্রকে খায়বারে সম্পদ ক্রয় করে দেন। **{উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯০, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল ফিকর থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত}**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.) সুচিন্তিত এবং বস্তুনিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন। মহানবী (সা.) বদরের (যুদ্ধ) সম্পর্কে যেসব সাহাবীর কাছে পরামর্শ চেয়েছেন তাদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **{আল্ ইস্তিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল ফিকর থেকে ২০০২ সনে মুদ্রিত}**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর উহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের বোনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যা ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে অথবা তিনি (রা.) নিজের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'এ যুদ্ধে অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে আমরা দেখি, মহানবী (সা.) কীভাবে দৃঢ় মনোবল এবং স্বীয় উন্নত নৈতিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আর মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের মন জয় করেছেন। এই যুদ্ধাবস্থা থেকে বুঝায় যায়, তিনি উন্নত নৈতিক চরিত্রের কীরূপ মহান মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন আর এই যুদ্ধে সাহাবীদের অতুলনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা সম্পর্কেও জানা যায়। তিনি (রা.) লিখেন, আমি সেই সময়কার কথা বলছি যখন যুদ্ধ শেষে তিনি মদীনায় ফিরে আসছিলেন, মদীনার যেসব মহিলা তার শাহাদতের ঘটনা শুনে ব্যাকুল ছিলেন, এখন তারা তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য মদীনা থেকে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন তার শ্যালিকা হিমনাহ্ বিনতে জাহাশ। তার খুবই

কাছের তিনজন আত্মীয় যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, তোমার প্রয়াত (আত্মীয়দের জন্য) কাঁদো বা আফসোস কর। এটি আবরী ভাষার একটি বাগধারা, এর অর্থ হল– আমি তোমাকে সংবাদ দিচ্ছি, তোমার প্রিয়জন মারা গিয়েছেন। হিমনাহ্ বিনতে জাহাশ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কোন মৃত আত্মীয়ের জন্য ক্রন্দন করব? তিনি বলেন, তোমার মামা হামযা শাহাদত বরণ করেছেন। একথা শুনে হযরত হিমনাহ্ বলেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। এরপর বলেন, খোদা তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, কতই না উত্তম মৃত্যু তিনি বরণ করেছেন! এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তোমার আরেকজন প্রয়াত আত্মীয়ের জন্য ক্রন্দন কর। হিমনাহ্ বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কার জন্য? তিনি বলেন, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশও শাহাদত বরণ করেছেন। হিমনাহ্ পুনরায় إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়েন এবং বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ তিনি তো খুবই ভালো মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, হিমনাহ্! তোমার আরেক প্রয়াত আত্মীয়ের জন্য তুমি ক্রন্দন কর। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কার জন্য? তিনি বলেন, তোমার স্বামীও শাহাদত বরণ করেছেন। একথা শুনে হিমনাহ্র চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করে এবং তিনি বলেন, হায় পরিতাপ। এটি দেখে মহানবী (সা.) বলেন, দেখ! এক মহিলা তার স্বামীর সাথে কত গভীর সম্পর্ক রাখে। আমি হিমনাহ্কে যখন তার মামার শাহাদতের সংবাদ দিলাম তখন সে বলল, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আমি যখন তাকে তার ভাইয়ের শাহাদতের সংবাদ দেই সে পুনরায় إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়ে, কিন্তু যখন আমি তাকে তার স্বামীর শাহাদতের সংবাদ দেই তখন সে আক্ষেপ করে বলে, হায় পরিতাপ, আর সে তার অশ্রু সংবরণ করতে পারে নি এবং শঙ্কিত হয়েছে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, মহিলা এমন সময় তার সবচেয়ে প্রিয় এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কে ভুলে যায় কিন্তু যে স্বামী তাকে ভালোবাসে তার কথা মনে থাকে। এরপর তিনি (সা.) হিমনাহ্কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে হায় পরিতাপ! কেন বললে? হিমনাহ্ বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তখন আমার তার পুত্রের কথা মনে পড়েছিল যে, (এখন) কে তার দেখাশোনা করবে?'

(এখানে স্বামীর ভালোবাসা নিজের জায়গায়, স্বামী যদি ভালোবাসে তাহলে স্ত্রী তাকে স্মরণ রাখে। কিন্তু (তিনি) তার সন্তানদের বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন আর এরই তিনি বহিঃপ্রকাশ করেছেন। এখানে বর্তমান যুগের পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। অর্থাৎ এমন স্বামী হতে হবে যে স্ত্রীকে ভালোবাসে আর বাচ্চাদের প্রতি সচেতন ও যত্নবান মা হতে হবে। প্রেমিক স্বামী হতে হলে স্ত্রী–সন্তানের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করাও আবশ্যক। আজকাল এ–সংক্রান্ত অনেক অভিযোগ আসে যে, পারিবারিক অধিকার প্রদান করা হচ্ছে না।)

এরপর মহনবী (সা.)ও কত চমৎকার কথা বলেছেন (দেখুন!) 'তিনি হিমনাহ্কে বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাদের জন্য তোমার স্বামীর চেয়ে অধিক যত্নবান কোন ব্যক্তি সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রতি যত্নবান উত্তম কোন ব্যক্তি যেন দণ্ডায়মান হন। অতএব, এই দোয়ার ফলেই হযরত হিমনাহ্ (রা.)'র বিয়ে হযরত তালহার সাথে হয় আর তাঁর পরিবারে মুহাম্মদ বিন তালহার জন্ম হয়। কিন্তু ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়, হযরত তালহা তার নিজের পুত্র মুহাম্মদের প্রতি ততটা ভালোবাসা এবং স্নেহ

প্রদর্শন করতেন না যতটা হিমনাহ্র পূর্বের সন্তানদের প্রতি করতেন। মানুষ বলতো, অন্যের সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তালহার চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। আর এটি মহানবী (সা.)-এর দোয়ার ফসল ছিল। ('মাসায়েব কে নিচে বারকাতোঁ কে খাযানে মাখফী হোতে হ্যাঁয়' আনওয়ারুল উলূম, ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ৫৬-৫৭)

দ্বিতীয় সাহাবী, যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি হলেন, হযরত কা'ব বিন যায়েদ (রা.)। তাঁর নাম হল কা'ব বিন যায়েদ বিন কায়েস বিন মালেক। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত কা'ব (রা.) বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং পরিখার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। বলা হয় উমাইয়া বিন রবীয়া বিন সাখ্খারের তীর লেগেছিল তার গায়ে। তিনি বীরে মাউনার সাহাবীদের একজন ছিলেন যেখানে তার সব সাথি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, কেবল তিনিই প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। (আল্ ইস্তিয়াব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যা থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)

বীর মাউনা সেই জায়গা যেখানে মহানবী (সা.) এক গোত্রের অনুরোধে তাঁর সত্তর জন সাহাবীকে প্রেরণ করেছিলেন, যাদের অনেকেই হাফিযে কুরআন এবং ক্বারী ছিলেন। আর তারা প্রতারণামূলকভাবে তাদের সবাইকে শহীদ করে, শুধু হযরত কা'ব ব্যতীত। আর হযরত কা'বও বীরে মাউনার এই ঘটনায় প্রাণে বেঁচে যান কারণ তিনি তখন পাহাড়ে উঠে গিয়েছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে কাফিররা আক্রমণ করে তাকেও গুরুতরভাবে আহত করে এবং তাকে মৃত মনে করে ফেলে রেখে চলে যায়। কিন্তু তখন তিনি জীবিত ছিলেন এবং এরপর কয়েক দিনের মধ্যে মদীনায় ফিরে আসেন। যাহোক, এরপর তিনি জীবন ফিরে পান এবং সুস্থ হয়ে উঠেন। {হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন এম, এ (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃঃ ৫১৮-৫১৯}

তৃতীয় সাহাবী যার উল্লেখ করবো তিনি হলেন, হযরত সালেহ্ শুকরান (রা.)। তাঁর মুল নাম ছিল সালেহ্ আর উপাধী ছিল শুকরান এবং এ নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। হযরত সালেহ্ শুকরান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আওফের ইথিওপিয়ান ক্রীতদাস ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নিজের সেবার জন্য পছন্দ করেন আর হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-কে মূল্য দিয়ে তাকে ক্রয় করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) তাকে বিনামূল্যে মহানবী (সা.)-কে উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছিলেন। {উসদুল গাবা ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯২, শুকরান (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সনে প্রকাশিত}

হযরত সালেহ্ শুকরান (রা.) বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি যেহেতু তখনো ক্রীতদাস ছিলেন, স্বাধীন ছিলেন না, তাই মহানবী (সা.) তার জন্য কোন অংশ বা মালে গনিমতের অংশ নির্ধারণ করেন নি। মহানবী (সা.) হযরত সালেহ্ শুকরানকে বন্দীদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত সালেহ্ শুকরান (রা.) যেসব লোকের নিগরানি বা তত্ত্বাবধান করতেন তারা স্বয়ং এর বিনিময়মূল্য প্রদান করত, এভাবে তিনি মালে গণিমতের চেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করেন। (সীরাত ইবনে কাসীর, বাবু যিকরে উবায়দা (রা.), পৃঃ ৭৫০, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যা থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত) অর্থাৎ মালে গণিমতের অংশ পান নি ঠিকই কিন্তু এই তত্ত্বাবধানের ফলশ্রুতিতে মালে গণিমতের চেয়েও বেশি সম্পদ তিনি লাভ করেন। বদরের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯২, শুকরান, বৈরুতের দ্বারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)

হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ সাদেক বলেন, হযরত শুকরান আসহাবে সুফ্ফার একজন ছিলেন। (হুলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৮, যিকরু আহলিস্ সুফ্ফা, মাকতাবাতুল ঈমান আল-মনসূরাহ থেকে ২০০৭ সনে মুদ্রিত) অর্থাৎ তিনি তাদের একজন ছিলেন, যারা সব সময় মহানবী (সা.)-এর দরজায় বসে থাকতেন। হযরত শুকরানের আরেকটি সৌভাগ্য হয়েছে আর তা হল, মহানবী (সা.)-কে গোসল দেয়া এবং তাঁর দাফন-কাফনেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। (আল্ ইসাবাহ্, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ২৮৪, শুকরান, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে তাঁর পরিধেয় কাপড়েই গোসল দেয়া হয়েছে আর তাঁর কবরে হযরত আলী, হযরত ফযল বিন আব্বাস, হযরত কুসাম বিন আব্বাস, হযরত শুকরান এবং অওস বিন খাওয়ালী অবতরণ করেছিলেন। (আস্ সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৪, হাদীস নং: ৭১৪৩, জিমাউ আবওয়াবিত তাকবীর আলাল জানায়েয... রিয়াদের আর্ রশীদ ছাপাখানা হতে ২০০৪ সনে মুদ্রিত)

হযরত শুকরান এ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমিই কবরে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দেহের নিচে মখমলের চাদর বিছিয়েছিলাম। (সুনান তিরমিযী, কিতাবুল জানায়েয, বাবু মা জাআ ফিস্ সাওবিল ওয়াহিদ... হাদীস নং: ১০৪৭)

মুসলিম শরীফের রেওয়াত অনুসারে তা লাল রঙের মখমলের চাদর ছিল। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, বাবু জা'লিল কাতীফাহ্ ফিল্ কাবরি, হাদীস নং: ২২৪১) এটি সেই চাদর ছিল যা মহানবী (সা.) ব্যবহার করতেন। কাজেই হযরত শুকরান বলতেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর পর অন্য কেউ এই চাদর গায়ে দিবে তা আমি পছন্দ করি নি, কেননা তিনি (সা.) এই চাদর গায়ে দিতেন এবং বিছাতেনও। (ইমাম নবী রচিত আল্ মিনহাজ বিশারহি সহীহ্ মুসলিম পৃ: ৭৪৯, কিতাবুল জানায়েয বাবু জা'লিল কাতীফাহ্ ফিল্ কাবরি, হাদীস নং: ৯৬৭, সনে দ্বার ইবনে হিযাম হতে ২০০২ মুদ্রিত)

মুরইয়াসী'র যুদ্ধের সময় বন্দী এবং মুরইয়াসী'দের ক্যাম্প থেকে যে ধনসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ও গবাদি পশু ইত্যাদি হস্তগত হয়েছিল সেগুলোর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মহানবী (সা.) হযরত শুকরান (রা.)-কে নিযুক্ত করেছিলেন। (ইমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩১৬, ফাসলে ফি যিকরে মাউলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯৯ সনে মুদ্রিত) এ দৃষ্টিকোন থেকে (তিনি) খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। (বিশ্বস্ততার সাথে) তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত উমর (রা.) হযরত শুকরানের পুত্র আব্দুর রহমান বিন শুকরানকে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)'র কাছে এই পত্র সহ প্রেরণ করেন যে, আমি তোমার কাছে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি হযরত আব্দুর রহমান বিন সালেহ্ শুকরানকে পাঠাচ্ছি, যিনি মহানবী (সা.)-এর মুক্তকৃত ক্রীতদাস ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দৃষ্টিতে তার পিতার পদমর্যাদাকে স্মরণ রেখে তাঁর সাথে ব্যবহার করবে। (আল্ ইসাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১, আব্দুর রহমান বিন শুকরান, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যা হতে ২০০৫ সালে মুদ্রিত)

এটি ছিল সেই পদমর্যাদা, যা ইসলাম ক্রীতদাসদেরও দিয়েছে অর্থাৎ শুধু দাসত্বের শৃঙ্খল থেকেই মুক্ত করে নি বরং তাদের সন্তানসন্ততিও সম্মানিত গণ্য হয়েছেন। একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত শুকরান (রা.) মদীনায় বসতি স্থাপন করেছিলেন আর বসরাতেও তার একটি বাড়ি ছিল। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে তাঁর ইন্তেকাল হয়। {আল্ ইসাবাহ্, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ২৮৫, শুকরান (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যা হতে ২০০৫ সালে মুদ্রিত}

(ইমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬, ফাযলে ফি যিকরে মাওলা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যা হতে ১৯৯৯ সালে মুদ্রিত)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হযরত মালিক বিন দুখশুম (রা.)'র। তাঁর সম্পর্ক খাযরাজ গোত্রের বনু গানাম বিন আওফের সাথে ছিল। ফুরাইয়াহ্ নামে তার এক কন্যা ছিল। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮২, মালেক বিন দুখশুম, বৈরুতের দ্বারুল্ এহইয়াউত তারাসিল্ আরাবী থেকে ১৯৯৬ সালে মুদ্রিত)**

হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.) উকবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন কি না এ সম্পর্কে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে ইসহাক এবং মূসা বিন উকবার মতে তিনি বয়আতে উকবায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, আলেমদের এমন বিতর্ক চলতেই থাকে। হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.) বদর, উহুদ, খন্দক এবং এরপরের সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। **(আল্ ইস্তিয়াব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫-৪০৬, মালেক বিন দুখশুম, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যা হতে ২০০২ সালে মুদ্রিত)**

কুরাইশের প্রবীণ এবং সম্মানিত নেতাদের একজন ছিলেন সুহেইল বিন আমর। তিনি বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ থেকে যোগদান করেন, আর হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.) তাকে বন্দী করেন।

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আমের বিন সা'দ তার পিতা হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস - এর বরাতে বর্ণনা করেন, "আমি বদরের যুদ্ধের দিন সুহেইল বিন আমরকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করি, যার ফলে তার রগ কেটে যায়। এরপর আমি প্রবাহিত রক্তের চিহ্ন দেখে অগ্রসর হতে থাকি। আমি দেখি, হযরত মালেক বিন দুখশুম তার কপালের চুল ধরে রেখেছেন। আমি বললাম, সে আমার বন্দী, আমি তাকে তির মেরেছি। কিন্তু হযরত মালেক বলেন, সে আমার বন্দী, আমি তাকে ধরেছি। পরে তাদের উভয়ে সুহেইলকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। তখন মহানবী (সা.) সুহেইলকে তাদের উভয়ের হাত থেকে নিয়ে নেন আর রওহা নামক স্থানে হযরত মালেক বিন দুখশুমের হাত থেকে সুহেইল পালিয়ে যায়। হযরত মালেক উচ্চস্বরে মানুষকে ডাকেন এবং তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এ সময় মহানবী (সা.) বলেন, যে–ই তাকে পায়, তাকে যেন হত্যা করে। (যুদ্ধের জন্য এসেছিল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, এরপর ধরা পড়ে আর বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে যায়, পুনরায় মুসলমানদের ক্ষতি করার আশঙ্কা ছিল, সে যেহেতু যুদ্ধবন্দী ছিল সে কারণেই এ নির্দেশ জারী করা হয়।) যাহোক, তার প্রাণ রক্ষার ছিল, তাই অন্য কারো হাতে আটক হওয়ার পরিবর্তে সুহেইল মহানবী (সা.)-এর হাতেই ধরা পড়ে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছে সে যখন ধরা পড়ে তখন তাকে তিনি (সা.) হত্যা করেন নি। তবে অন্য কোন সাহাবীর হাতে ধরা পড়লে অবশ্যই তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু যেহেতু মহানবী (সা.)-এর হাতে ধরা পড়েছে তাই তিনি (সা.) তাকে হত্যা করেন নি।"

{এটি হলো আদর্শ আর তাঁর এই আদর্শ সেসব সীমালঙ্ঘনকারীর আপত্তির উত্তর যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি দোষারোপ করে যে, তিনি নাকি অন্যায় করেছেন আর হত্যা এবং খুনাখুনি করেছেন। অথচ যে শাস্তিযোগ্য ছিল আর যার শাস্তির বিষয়ে সিদ্ধান্তও হয়ে গিয়েছিল, সেই ব্যক্তিও যখন তাঁর কাছে ধরা পড়ে, তাকেও তিনি (সা.) হত্যা করেন নি।}
"একটি রেওয়ায়েত অনুসারে সুহেইলকে মহানবী (সা.) পেয়েছিলেন বাবলা গাছের ঝোপের

ভেতরে। তখন মহানবী (সা.) নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাকে ধরে ফেল। এরপর তার হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে ফেলা হয় অর্থাৎ (তাকে) বন্দী করা হয়।" **(তারীখে দামেস্ক লে- ইবনে আসাকার, ১২তম খণ্ড, ২৪ অধ্যায়, পৃ: ৩৩৩, সুহেইল বিন আমর বিন আব্দুশ্ শামস, বৈরুতের দ্বারুল্ এহইয়াউত তারাসিল্ আরাবী থেকে প্রকাশিত)**

সহীহ্ বুখারীতে এই রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত ইতবান বিন মালেক, যিনি মহানবী (সা.)-এর সেসব আনসারী সাহাবীর একজন ছিলেন, যারা বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, (তিনি) মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে, আমি আমার জাতির ইমামতি করি। যখন বৃষ্টি হয় তখন সেই নালা ও আমার বসতির মাঝে পানি জমে যায়, যার ফলে তাদের মসজিদে গিয়ে আমি নামায পড়াতে পারি না। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার বাসনা হলো, আপনি আমার বাড়িতে আসুন আর আমার ঘরে নামায পড়ুন, তাহলে আমি সেটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করব। মহানবী (সা.) বলেন, ইনশাআল্লাহ, আমি আসব। তিনি বলতেন যে, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) প্রভাতে সূর্য উদিত হওয়ার পর একদিন আমার বাড়িতে আসেন। আর তিনি (সা.) অনুমতি চান, আমি তাঁকে অনুমতি দেই। তিনি (সা.) যখন বাড়িতে প্রবেশ করেন তখন তিনি আসন গ্রহণ না করেই বলেন, বাড়ির কোন জায়গায় তুমি চাও যে, আমি নামায পড়ি? তিনি বলেন, আমি ঘরের একটি কোণার দিকে ইঙ্গিত করে তাঁকে দেখিয়ে দেই যে, আমি চাই আপনি এখানে (নামায পড়েন)। মহানবী (সা.) নামাযের জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে যান আর নামায পড়েন এবং আল্লাহ্‌হু আকবার বলেন আর আমরাও সেখানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই। তিনি (সা.) দুই রাকাত নামায পড়েন, এরপর সালাম ফেরান। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খাজিরা যা মাংস ও আটা দ্বারা প্রস্তুতকৃত একপ্রকার খাবার তাঁর (সা.) সামনে উপস্থাপনের মানসে তাঁকে বসতে বলি, যা তাঁর জন্য আমরা প্রস্তুত করেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, বাড়িতে পাড়ার কিছু মানুষও সমবেত হয়, তাদের মধ্য থেকে কেউ একজন বলেন, মালেক বিন দুখশুম কোথায়? তখন তাদের মধ্য থেকেই কোন একজন বলেন, সে তো মুনাফিক, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালোবাসে না। (সেই এলাকাতেই যেহেতু তিনি থাকতেন তাই তার না আসাতে হয়ত কেউ এমন মন্তব্য করেছেন।) মহানবী (সা.) বলেন, এমন কথা বলো না, তোমরা কি দেখ না সে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'**র স্বীকারোক্তি দিয়েছে আর এর মাধ্যমে সে খোদা তা'লার সন্তুষ্টিই সন্ধান করে। তখন সেই ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। পুনরায় সেই ব্যক্তি বলেন, মুনাফিকদের প্রতি তার মনোযোগ এবং তার হিতাকাঙ্খাই আমরা দেখি। (হৃদয়ের কোমলতার কারণে তিনি হয়ত মুনাফিকদেরও তবলীগ করতে এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে টেনে আনতে চাইতেন, তাই তাদের প্রতি সহানুভূতিও রেখে থাকবেন হয়ত। আর এ কারণেই হয়ত সাহাবীদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।) মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই সে ব্যক্তির জন্য অগ্নিকে হারাম করে দিয়েছেন যে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র স্বীকারোক্তি দেয়**। কিন্তু শর্ত হলো এ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টি কামনা করা।" **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, বাব আল্ মাসাজিদ ফীল্ বয়ূত, হাদীস নং: ৪২৫)**

এটি সেসব নামধারী আলেমদেরও খণ্ডন যারা কুফরি ফতওয়া প্রদান করে থাকে আর বিশেষ করে এ প্রেক্ষাপটে যারা আহমদীদের ওপর যুলুম এবং অত্যাচার করে। এই নামধারী

আলেমদের ফতওয়াই মুসলমান দেশগুলোর শান্তি-শৃঙ্খলাকে পদদলিত করে রেখেছে। বর্তমানে পাকিস্তানে **‘লাব্বায়েক ইয়া রসূলুল্লাহ্’** নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা ধ্বনি উত্তোলন করে **‘লাব্বায়েক ইয়া রসূলুল্লাহ্’** কিন্তু মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশ, যে ব্যক্তি **‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’** বলে তাকেও তুমি একথা বলবে না যে, তুমি মুসলমান নও। খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কেউ যদি এই ঘোষণা দেয়, তাহলে আল্লাহ্ তা’লা তার জন্য অগ্নি হারাম করে দিয়েছেন। আর এরা বলে যে, না, তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা দিচ্ছো না। হৃদয়ের খবর এরা মহানবী (সা.)-এর চেয়েও যেন বেশি জানে। আল্লাহ্ তা’লা এদের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করুন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হযরত মালেক বিন দুখশুম (একজন) মুনাফিক। তখন মহানবী (সা.) বলেন, সে কি **‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’**র সাক্ষ্য দেয় না? উত্তরে ইতবান বলেন, কেন নয়, কিন্তু এর কোন সাক্ষী নেই। (এরপর) মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সে কি নামায পড়ে না? তিনি বলেন, কেন নয় কিন্তু **‘ ওয়া লা সালাতা লাহু’** অর্থাৎ তার নামায কোন নামায নয়। (হয়তো তাদের কতকের মাঝেও বর্তমান সময়ের মৌলভীদের মত কিছু কঠোরতা ছিল।) মহানবী (সা.) বলেন, এরাই সেসব লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা আমাকে নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বারণ করেছেন।” **(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩০, মালেক বিন আল্ দুখশুম, বৈরুতের দ্বারুল ফিকর থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)** হৃদয়ের অবস্থা কেবল আল্লাহ্ তা’লাই জানেন।

মহানবী (সা.)-কে তো আল্লাহ্ তা’লা বারণ করেছেন কিন্তু এসব আলেমের বিশেষ করে পাকিস্তানী আলেমদের কথা অনুসারে, তাদের কাছে আল্লাহ্‌র নামে যাচ্ছেতাই যুলুম বা অত্যাচার করার লাইসেন্স কিংবা সনদ রয়েছে।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সামনে হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.) সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলা হলে মহানবী (সা.) বলেন, **‘লা তাসুব্বূ আসহাবী’** অর্থাৎ তোমরা আমার সাথিদেরকে গালমন্দ কোরো না। **(আল ইস্তিয়াব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪০৬, মালেক বিন আল্ দুখশুম, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা থেকে ২০০২ সালে মুদ্রিত)**

মহানবী (সা.) তাবূকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় মদীনা থেকে কিছুটা দূরত্বে **‘যী-আওয়ান’** নামক স্থানে অবস্থান করেন। তখন মসজিদে যিরার সম্পর্কে তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়। তিনি (সা) হযরত মালেক বিন দুখশুম এবং হযরত মা’ন বিন আদী (রা.)-কে ডেকে পাঠান আর মসজিদে যিরার অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত মালেক বিন দুখশুম এবং হযরত মা’ন বিন আদী দ্রুত বনু সালেম গোত্রে পৌঁছেন, যা হযরত মালেক বিন দুখশুমের গোত্র ছিল। হযরত মালেক বিন দুখশুম হযরত মা’নকে বলেন, আমায় কিছুটা সময় দিন, আমি বাড়ি থেকে আগুন নিয়ে আসি। অতএব তিনি বাড়ি থেকে খেজুরের শুষ্ক ডালে আগুন ধরিয়ে নিয়ে আসেন, এরপর তারা উভয়েই মসজিদে যিরারে যান। অপর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়ে (তারা) সেখানে পৌঁছেন আর সেখানে গিয়ে আগুন লাগিয়ে সেটিকে ধূলিসাৎ করেন।” **(শরাহ্ যুরকানী, আলা মওয়াহিবুল্ লিদুন্নীয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৭-৯৮, বাব গাযওয়া তাবূক, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯৬ সালে মুদ্রিত)**

কাজেই, (কিছু) ভুল বোঝাবুঝির কারণে সাহাবীদের সম্পর্কে আমরা কুধারণা করতে পারি না। যার সম্পর্কে কারো কারো এই ধারণা ছিল যে, হয়তো তিনি ভুল পথে এগিয়েছেন, এমনকি তাকে মুনাফিকও আখ্যা দেয়া হয় কিন্তুপরবর্তীতে তিনিই আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে মুনাফিকদের কেন্দ্রকে ধ্বংস করার এবং নির্মূল করার কারণ হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন আর আমাদেরকেও (এই) আত্মজিজ্ঞাসা করার তৌফিক দান করুন যে, খোদার আদেশ নিষেধ কী আর আমরা কতটা তা পালন করছি।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)